০৬-০২-১৯ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - অশরীরী হয়ে আপন ঘরে ফিরতে হবে এবার, তাই কারও সাথে কথা বলার সময় আমি আত্মা ভাই সেও আত্মা ভাই, এই ভাই-ভাই স্বরূপেই কথা বলবে। দেহী অভিমানী হওয়ার অভ্যাসে অভ্যাসী হও"

প্রশ্ন :- ভবিষ্যতের রাজ-তিলক প্রাপ্তির আধার কি ?

উত্তর :- জ্ঞানের পাঠ। প্রত্যেককেই এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে রাজ-তিলকের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বাবার কর্তব্য হল পড়ানো, আশীর্বাদ দেওয়া নয়। এতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস এলে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। কোনও প্রকার ভুল করা চলবে না। যদি মতভেদের কারণে এই পাঠ ছেড়ে দাও, তবে তুমিই অকৃতকার্য হবে। তাই বাবা বলেন-মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেই নিজের প্রতি দয়াবান হও। আশীর্বাদ চাইবার প্রয়োজন পড়ে না, পঠন-পাঠনে মনোনিবেশ করো।

ওঁম্ শান্তি! সুপ্রীম টিচার বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়ান। বি.কে. বাচ্চারাও তা জানে, এই পরমপিতা পরমাত্মা যেমন তাদের প্রকৃত পিতা তেমনই টিচারও । তিনি যেভাবে পড়ান, তা আর কেউ পড়াতে পারে না। তাই তোমরা বলো, শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। কিন্তু শিববাবা কোনও একজন বা অল্প কয়েকজনের বাবা তো আর নন। তিনি "মন্মনাভব", "মধ্যাজী ভব"-এর অর্থ বুঝিয়ে বলেন, যার অর্থ : একমাত্র ওনাকেই স্মরণ করো। বাচ্চারাও যথেষ্ট বুদ্ধিমান এখন। অসীমের বাবাও আশ্বস্ত করছেন, তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার তো তোমরা পাবেই পাবে-একথা কখনও ভোলা উচিত নয় । (পরমাত্মা) বাবা আত্মাদের সাথেই কথা বলেন । এখন তোমরা হলে জীবাত্মা, তাই না ! অসীমের (বেহদের) বাবা-ও হলেন নিরাকার। তোমরা জানো যে, ব্রহ্মার শরীরের সাহায্য নিয়েই তোমাদেরকে এই পাঠ পড়াচ্ছেন, অন্যেরা তা সঠিক বুঝে উঠতেই পারবে না। স্কুলের টিচার যখন পড়ান, তখন বলো-লৌকিক টিচার ওনার লৌকিক বাচ্চাদের পাঠ পড়াচ্ছেন। কিন্তু এই টিচার হলেন পারলৌকিক সুপ্রীম-টিচার, যিনি ওঁনার পারলৌকিক বাচ্চাদেরকেই পড়ান। প্রকৃত অর্থে তোমরা পরলোক অর্থাৎ মূল-বতনের বাসিন্দা। বাবা-ও তো সেই পরলোকেই থাকেন। বাবা এবং বাচ্চারা উভয়েই আমরা সেই একই ধামেরই বাসিন্দা। তোমরা হলে আত্মা আর আমি পরম-আত্মা। এই জাগতিক দুনিয়ায় তোমরা এসেছ তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা পালন করতে। এই পার্ট করতে করতে এখন তোমরা একেবারে পতিত অবস্থায় এসে পৌঁছেছো। এ হল এক অসীম আশ্চর্য বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ, যেখানে চলছে এই অবিনাশী নাটক, আর তোমরা সবাই কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়কারী। সম্পূর্ণ সৃষ্টি -জগৎটাই এই নাটকের কর্মক্ষেত্র। একমাত্র তোমরাই তা জানো, এটা অসীম-বেহদের অবিনাশী নাটক। যা দিন ও রাত দুই ভাগে করা আছে। এখানে সূর্য ও চন্দ্র বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে আলোর কাজ করে। যা অসীমের ব্যাপার। এসব জ্ঞান তো তোমরা পেয়েছ। রচয়িতা স্বয়ং এসে তাঁর রচিত রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দেন তোমাদেরকে।

বাবা জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, আমি তোমাদের রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যগুলি জানাতেই তো এসেছি। এটা হল পাঠশালা। তোমাদের পাঠদানকারী স্বয়ং অভোক্তা। এমনটি আর কেউ বলবে না- "আমি অভোক্তা"। যদিও আমেদাবাদের এক সাধু এমনটাই বলতো, কিন্তু পরে তার সেই মিথ্যা ধরা পড়ে গেছে। বর্তমানে তো প্রচুর সংখ্যায় এমন ঠকবাজ আছে। সাধুর বেশধারীও অনেক আছে।

কিন্তু এঁনার তো কোনও বেশ-ই নেই। যেমন লোকেরা ভাবে কৃষ্ণই গীতা শুনিয়েছিল, তেমনি এমন কত লোকেই আজকাল কত কৃষ্ণকে উপস্থাপন করে। এত কৃষ্ণ তো আর হতে পারে না। এখানে স্বয়ং শিববাবা এসে তোমাদেরকে পড়ান, অর্থাৎ আত্মাদেরকে শোনান।

তোমাদের বার-বার বলা হয়, নিজেকে আত্মা ভেবে, আত্মা ভাই-ভাইকে শোনাও। মন-বুদ্ধিতে একথা যেন থাকে- বাবার এই জ্ঞান আমার ভাইকে শোনাচ্ছি। পুরুষ কিম্বা নারী উভয়েই ভাই-ভাই। সবাই একই ভাবে বাবার অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকারী। জাগতিক দুনিয়ায় নারীরা সম্পত্তির অধিকার পায় না, যেহেতু তাদেরকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে তো সবাই আত্মা। অশরীরী হয়েই তো যেতে হবে আপন ঘরে। এখন যেসব জ্ঞান-রত্নে জ্ঞানী হচ্ছ তোমরা, এগুলিই পরে অবিনাশী জ্ঞান-রত্নে পর্যবশিত হয়। আত্মাই জ্ঞানের সাগর হয়। কর্ম-কর্তব্য যা কিছু, তা তো করে আত্মাই। তবুও মানুষের মধ্যে দেহ-অভিমান হবার কারণে তারা দেহী-অভিমানী হতে পারে না। বি.কে.-দেরকে দেহী-অভিমানী হয়ে একমাত্র এই বাবার সাথেই স্মরণের যোগে অভ্যাসী হতে হবে। এটুকু পরিশ্রম তো করতেই হবে। লৌকিকে যারা আছে, তারা তাদের গুরুকে কতই না স্মরণ করে। সামনে আবার তার মূর্ত্তিও রাখে। একবার ভাবো, কোথায় শিব-ভগবানের চিত্র আর সেখানে সাধারণ মানুষের চিত্র। যা রাত-দিনের তফাত। কেউ-কেউ আবার লকেটে গুরুর ফটো রেখে তা ধারণ করে। যদিও তাদের পতিরা তা পছন্দ করে না। তবে তা শিবের ফটো হলে তাতে আপত্তি করে না। তা তো সবারই ভাল লাগে, যেহেতু শিব যে পরমপিতা পরমাত্মা। লকেটে ওঁনার চিত্রই হওয়া উচিত। এই শিবই তো তোমাদেরকে ওঁনার গলার হার বানান। তোমরা বি.কে.-রাই সেই রুদ্র-মালার মুক্তো। যদিও সমগ্র দুনিয়াটাই এক বিশাল রুদ্র-মালা। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও তেমনি মালা আছে। কুলাচার্য (ব্রহ্মা) রূপে যা কল্প-বৃক্ষের একেবারে উপরে এই শ্রেণী বা বংশ তালিকা অবস্থিত। ঠিক যেমনটা হয় জাগতিক বংতালিকায়, তেমনি তা অসীমের কুল বা বংশ-তালিকা। মনুষ্য মাত্রের সবারই মালা হয়।

আত্মা অতি ক্ষুদ্র, বিন্দুর মতন। যা অতি ক্ষুদ্রাকার। এরকমই একটার পর একটা অসংখ্য বিন্দুর সংযোগে যা হবে তার গুনতি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। এত অসংখ্য আত্মার কল্প-বৃক্ষ যথেষ্টই ছোট। ব্রহ্মতত্ত্বের খুব অল্প জায়গাতেই থাকতে পারে। সেখান থেকেই আত্মারা আসে এই দুনিয়ার বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে যে যার কর্ম-কর্তব্যের পার্টের অভিনয় করতে। এই দুনিয়াটা যেমন অনেক বড়, তেমনিই জটিল। এখানে লোকেরা এরোপ্লেনে এক জায়গা থেকে দূরের অন্য জায়গায় যায়, কিন্তু সেখান থেকে দূরে কোথাও যাবার জন্য কোনও এরোপ্লেনের প্রয়োজন পড়ে না। সেখানে আছে কেবল আত্মাদের একটা ছোট বৃক্ষের ঝাড়। আর এখানে তো মানুষের কত বড়-বড় ঝাড়।

তোমরা বি.কে.-রা সবাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। যে ব্রহ্মাকে লোকেরা কেউ 'এডম' কেউ 'আদি দেব' বলে। সেক্ষেত্রে নারী-পুরুষও থাকবে অবশ্যই। যেহেতু তোমরা প্রবৃত্তি-মার্গের। নিবৃত্তি-মার্গে সে খেলা নেই। তাই এক হাতে আর কি বা হবে। কিছু হওয়ার জন্য তো উভয় হাতেরই প্রয়োজন। তেমনি আত্মাও দুটো হলেই তো একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে। যেমন গাড়ীর এক চাকা অন্যের তালে তাল মিলিয়ে চলতে না পাড়লে, গাড়ীর সাধারণ গতি কমে যায়। কিন্তু একটির কারণে অন্যটিকেও তো থামিয়ে দেওয়া যায় না। কল্পের শুরুর প্রথম দিকে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গই ছিল। অধোগতির নিয়মে ধীরে ধীরে যা অপবিত্র হতে থাকে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এসব জ্ঞান

আছে। এও জানো, এই বৃক্ষের ঝাড়ের বৃদ্ধি কিভাবে হয়। কিভাবে এতে সব যোগ হতে থাকে। এমন বৃক্ষ মানুষে তো আর তৈরি করতে পারে না। তাদের কারও বুদ্ধিতে রচয়িতার এই রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানই তো নেই। তাই তো বাবা বলেছিলেন - তোমরা তা লিখে জানাও, রচয়িতার দ্বারা রচনার এই আদি-মধ্য-অন্তের এই জ্ঞানকে কে কেমন জেনেছ। লোকেরা না তো রচয়িতাকে জানে, আর না জানে তার রচনাকে। তবে এই জ্ঞান যদি পরম্পরায় চলে আসতো, তবে হয়ত কেউ কেউ তা বলতেও পারত। একমাত্র তোমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা ছাড়া এই জ্ঞানের কথা আর কেউই বলতে পারবে না।

বাচ্চারা, তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বি.কে.ব্রাহ্মণদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা। বি.কে. ব্রাহ্মণদের এই ধর্মই সর্বকালের সর্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বোচ্চ ধর্ম। বোঝাবার সময় সেই চিত্রকেও দেখাবে তোমরা। তা না হলে সেভাবে বুদ্ধিতে টিঁকে থাকে না। চিত্রগুলি একটু বড়-বড় হওয়া উচিত। পরে কিভাবে এতসব বিভিন্ন ধর্মের বিস্তার ঘটে, তাও জানাতে হবে তাদের। কিছু পূর্বেও লোকেরা বলতো- "যে আত্মা সে-ই পরমাত্মা - যে পরমাত্মা সে-ই আত্মা"! এখন বাবা এসে তার যথার্থ অর্থও বুঝিয়েও দিয়েছেন। সেই হিসাবে বর্তমানে "যে আমি বি.কে.ব্রাহ্মণ আগামীতে সেই আমিই বি.কে. দেবতা" হব, সেই নতুন দুনিয়ায়। এখন আমরা রয়েছি পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে, অর্থাৎ এটা হল পুরুষোত্তম রূপে নিজেকে গড়ে তোলার সময়। এই বিষয়গুলি তোমরা তাদের রচয়িতা আর রচনার অর্থ, হাম সো-এর অর্থ বোঝাতে পার । ওঁম্-এর অর্থ হল-"আমি আত্মা", এটা হল প্রথমে, তার পরে হল এই শরীর। আত্মা অবিনাশী আর এই শরীর হল বিনাশী। আমি আত্মা এই শরীরকে ধারণ করে ভূমিকা পালন করি। এই ভাবকেই বলা হয় আত্ম-অভিমানী। মূল অর্থে আমি আত্মা এসব করি এবং এই আত্মাই নানারকম ভূমিকা পালন করে। এই আত্মাই আবার পরমাত্মার সন্তান। সত্যি, কি আশ্চর্যের এই জ্ঞানের পাঠ ! আর এই জ্ঞান একমাত্র এই বাবার কাছেই আছে, তাই তো তোমরা একমাত্র এই বাবাকেই ডাকতে থাকো। বাবা যে জ্ঞানের সাগর। ওঁনার তুলনায় অন্যেরা যেন অজ্ঞানতার সাগর। কল্পের অর্ধেকটা জ্ঞানের, অর্ধেকটা অজ্ঞানের। এই জ্ঞানের ব্যাপারটা কারও জানা নেই। রচয়িতার দ্বারা ওঁনার রচনাকে জানতে পারাকেই জ্ঞান বলা হয়। যেহেতু একমাত্র রচয়িতার কাছেই সেই জ্ঞান থাকে। সেই হিসাবে ওঁনাকে আবার সৃষ্টি-কর্তাও বলা হয়। লোকেও তাই ভাবে সৃষ্টিকর্তাই এই রচনা রচেছেন। বাবা জানাচ্ছেন - এ তো অবিনাশী অনাদি তৈরি করা এক বিশেষ নাটক। তাই তো তারা বাবাকে ডাকতে থাকে, পতিত-পাবন এসো। সেক্ষেত্রে রচয়িতা বলা যায় কিভাবে? রচয়িতা তখনই বলা চলে, যখন প্রলয় হয়ে সব ধ্বংসের পর আবার সেই রচনা রচিত হয়। এই বাবা কেবল পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান। ইনি তো সমগ্র বিশ্বের বৃক্ষরূপী ঝাড়, ওনারই জ্ঞান দানে তোমরা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা আদি-মধ্য-অন্তের এই জ্ঞানে জ্ঞানী হও। যেমন মালী প্রত্যেক বীজ আর তার বৃক্ষকে জেনে থাকে। বীজকে দেখেই সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান তার বুদ্ধিতে এসে যায়। তেমনি ইনিও হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। কেউই ওঁনাকে জানতে পারে না। অথচ ওঁনার উদ্দেশ্যেই বলে থাকে, পরমপিতা পরমাত্মাই সৃষ্টি জগতের বীজরূপ। সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ, সুখ, শান্তি, পবিত্রতার সাগর। একমাত্র তোমরাই তা জানো, এইসব জ্ঞান পরমপিতা পরমাত্মা এনার শরীরের দ্বারাই তা শোনাচ্ছেন। আর সেই উদ্দেশ্যেই তো ওঁনার আসা। তা না হলে পতিতদেরকে পবিত্র হবার প্রেরণা দেবেন কিভাবে। তাই তো বাবা স্বয়ং এখানে এসে সবাইকে পবিত্র বানিয়ে সাথে করে নিয়ে যান। সেই বাবা-ই এখন তোমাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন।

বর্তমানের এই সময়কালটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই বিষয়ে তোমরা ভাষণও করতে পারো যে, কিভাবে পুরুষ (আত্মা) তমোপ্রধান অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ সতোপ্রধান অবস্থায় পৌঁছায়। যদিও তোমাদের কাছে এমন আরও অনেক বিষয় আছে। যেমন এই পতিত তমোপ্রধান দুনিয়া সতোপ্রধান হয় কিভাবে-এটা জানাবার মতন বিষয় বটে। আগামীতে লোকেরা নিজেরাই তোমাদের এই জ্ঞান শোনার জন্য এখানে আসবে। জ্ঞানের পাঠ পড়তে পড়তে কেউ যদি ছেড়েও দেয়, আবার সে আসবেই। কারণ গতি-সদগতি হাটের ঠিকানা এই একটাই। তাই তো তোমরা এভাবে জোরের সাথে বলতে পারো, সবারই সদগতিদাতা একমাত্র এই বাবা। যাকে শ্রী শ্রী বলা হয়। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠরও শ্রেষ্ঠ যিনি পরমপিতা পরমাত্মা। একমাত্র উনিই পারেন আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ করে গড়ে তুলতে। যেমন শ্রেষ্ঠ হল সত্যযুগ - আর ভ্রষ্ট হল কলিযুগ। তাই তো লোকেরা অন্যদেরকে ভ্রষ্টাচারী বলে। অথচ নিজেরটা বিচার করে না। কিন্তু আসল কথা হল, এই পতিত দুনিয়ায় এমন একজনকেও খুঁজে পাবে না, যিনি শ্রেষ্ঠ। শ্রী শ্রী এলে তবেই তো শ্রেষ্ঠ বানাবে। সত্যযুগের আদিতে এই শ্রী উপাধি থাকে দেবতাদের। এখন তো সবাইকেই অনায়াসে এই শ্রী শ্রী বলে দেওয়া হয়। যদিও বাস্তবে এই শ্রী শব্দটা পবিত্রতার প্রতীক। অন্য ধর্মাবলম্বীরা কিন্তু নিজেদেরকে শ্রী বলে প্রচার করে না। এমনকি পোপের ক্ষেত্রেও শ্রী ব্যবহার করে না। আর এখানে তো সবার ক্ষেত্রেই তা করতেই থাকে। এ যেন, কোথায় রাজহংসের মুক্তো খাওয়া আর কোথায় বকের বাজে জিনিস খাওয়া। এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ তো আছেই। দেবতারা নিজেরাই যেখানে ফুলের মতন, সেখানে বর্তমানের এসব হল "গার্ডেন অফ আল্লাহ্"- (কোথায় শিববাবার তৈরী সত্যযুগের ফুলের বাগান আর কোথায় রাবণ-মায়ার এই আবর্জনার জঞ্জাল)! কিন্তু বাবা তো তোমাদেরকে ফুলের মতো সুন্দর করে গড়ে তোলেন। সেই ফুলের মধ্যেই আবার নানা প্রকারের (ভ্যারাইটির) ফুলও আছে। সবচেয়ে ভালো কিং-ফ্লাওয়ার। লক্ষ্মী-নারায়ণকে নতুন দুনিয়ার কিং-কুইন ফ্লাওয়ার বলা হয়।

বাচ্চারা, তোমাদের তো আনন্দ হওয়া উচিত এখানে বাইরের কোনও কিছু করতে হয় না। এই যে মোমবাতি প্রদীপ এসব জ্বালানো হয়, তারও তো একটা অর্থ থাকা দরকার। তা কি কেবল শিব-জয়ন্তী বা দীপাবলীতেই জ্বালানো উচিত? দীপাবলীতে লক্ষ্মীকে আহ্বান করা হয়। তার কাছে ধনসম্পদ প্রার্থনা করা হয়। যেখানে ধনসম্পদের ভাণ্ডার তো শিববাবার। তিনি অর্থাৎ ভোলা-ভাণ্ডারী তার ভাণ্ডারে ধনসম্পদ পূর্ণ করেন। বাচ্চারা, তোমরাও তা জানো, তোমাদের অফুরন্ত সেই ভাণ্ডার শিববাবাই পূর্ণ করে দেন। এই ধনসম্পদ হলো জ্ঞান-রত্নের সম্পদ। যার ফলে সেখানে তোমরা থাকো বিশাল ধনসম্পদে ধনী। নতুন দুনিয়ায় তোমরা নানা রত্নরাজিতে থাকো পরিপূর্ণ। সত্যযুগে তোমাদের থাকে অনেক অনেক পরিমানে হীরে-জহরত। আবারও তা তেমনই হবে। এতেই মানুষ দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এসব যদি শেষই হয়ে যায়, তবে আবার তা আসবে কোথা থেকে ? খনি-ই যদি খালি হয়ে যায়, পাহাড় যদি ভেঙ্গে পড়ে, তবে আর আগের মতন হব কি প্রকারে? তখন তাদের বলবে-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি তো হবেই। পূর্বে যেমনটি হয়েছিল, আবারও ঠিক তেমনটাই হবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন পুরুষার্থ করে চলেছ, স্বর্গ-রাজ্যের অধিকার পাওয়ার লক্ষ্যে। স্বর্গ-রাজ্যেরও হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি একই নিয়মে পুনরাবৃত্তি হয়। গীতেও তো তা আছে- এই সমগ্র সৃষ্টি, আকাশ-সমুদ্র সবই, সম্পূর্ণ পৃথিবীই যে আমাদের তুমি দিয়ে দাও, যা অন্যেরা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। তার তুলনায় এখন কি বা আছে মোদের। সামান্য একটু জমির জন্য, তেষ্টা নিবারণের জন্য সামান্য জল, এমন কি ভাষার জন্যও মানুষ লড়াই-ঝগড়া করে ।

যে বাবা সেই স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা সেই বাবার জন্মদিন পালন করি আমরা। যেহেতু উনি যে স্বর্গ-রাজ্যের বাদশাহী দিয়ে থাকেন আমাদের। সেই বাবাই স্বয়ং এখন এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন ওঁনার বাচ্চাদেরকে। পাঠের সময় তোমাদের এই শরীরের নাম-রূপ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র ভেবে, কেবল আত্মা-রূপে দেখতে হবে। পবিত্র যে হতেই হবে - হয় তা যোগবলের দ্বারা নয়তো শাস্তি ভোগ করে। তাতে অবশ্য পদেরও অবনতি হয়। যেমন স্টুডেন্ট-এর বুদ্ধিতে অবশ্যই তা থাকে, সে কোন্ বিষয়ে কত নম্বর পেতে পারে। আবার সে এটাও বোঝে টিচার তাকে কত সুন্দর করে পড়িয়েছে। তাই তো স্টুডেন্টও টিচারকে উপহার দেয়। আর এখানে তো বাবা তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের মালিক বানায়। তাই তো তোমরা সেই ভক্তি-মার্গে থাকাকালীন সময় থেকেই ওনাকে এভাবে স্মরণ করে আসছো। এবার বলো, এমন বাবাকে (টিচারকে) তোমরা কি উপহার দেবে? বর্তমানের এসব যা কিছুই দেখছ, তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। যেহেতু এসবই পুরানো ছিঃ-ছিঃ দুনিয়ার। আর তাই তো তোমরা বাবাকে ডাকতে থাকো এভাবে। বাবাও তেমনি তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে দেন। অতএব বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই অবিনাশী নাটককে স্মরণ তো করতেই হবে। যেহেতু তোমরা এখন জেনে গেছ, এই রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে। মুস্কিল হলো, বাবা যা কিছু তোমাদেরকে শোনান, তা শুনেও পরে তা ভুলেও যাও। প্রতি ৫-হাজার বর্ষ বাদে-বাদে এই চক্র ঘুরতে-ঘুরতে সেই পুরানো অবস্থানেই আসে। (ঘড়ির মতন) অর্থাৎ তা সম্পূর্ণ হয়। তেমনি তোমাদের এই কর্ম-কর্তব্যের পার্টও খুবই সুন্দর। তাই তোমরাও সতোপ্রধান হয়ে তেমনি সুন্দর হও। পরে তোমরাই আবার তমোপ্রধান কুৎসিতে পরিণত হও। তাই তো বাবাকে ডাকতে থাকো-"বাবা এসো, এবার এসো বাবা।" আর তাই বাবা এসেছেন এখন। এই দৃঢ় বিশ্বাস এলে অবশ্যই বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে তোমাদের। এতে কোনও ভুল-ভ্রান্তি করা চলবে না। কেউ কেউ মতভেদের কারণে পঠন-পাঠনই ছেড়ে দেয়। এমনকি শ্রীমৎ অনুসারে চলাও ছেড়ে দেয়। কিন্তু জ্ঞানের এই পাঠ না পড়লে তোমরা তো অকৃতকার্য হয়ে যাবে। তাই তো বাবা বলেন, তোমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি কৃপা করো। প্রত্যেককেই নিজ নিজ অনুসারে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে নিজেকে রাজ-তিলকের যোগ্য করে তুলতে হবে। বাবার কর্ম-কর্তব্য কেবল পাঠ পড়ানো। এতে কোনও অবিনাশী উত্তরাধিকারের ব্যাপার নেই। তা যদি হত, তবে তো সবাইকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে হয়। এমন সব কৃপা ইত্যাদি চাওয়া, যা ভক্তি-মার্গের প্রার্থনা। এখানে সেসব ব্যাপার নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত! ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রবৃত্তিতে (পরিবারে) সবার সাথে মিলেমিশে থেকেই নিজেই নিজের সাথে প্রতিযোগিতা করবে। আর যদি কোনও কারণে কোনও একটি চাকা ঢিলে হয়ে যায়, সে কারণে থেমে যাবে না। নিজেকে রাজ-তিলকের যোগ্যতা-সম্পন্ন তৈরী করতে হবে।

২) শিব-জয়ন্তী উৎসব খুব ধুমধাম করে পালন করতে হবে। যেহেতু শিববাবা এতসব জ্ঞান-রত্নে ধনী করেন, যার ফলে আগানী নতুন দুনিয়ায় তোমরা সমৃদ্ধিশালী হও এবং তোমাদের সর্বপ্রকার ভাণ্ডারই পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

বরদান :- সর্ব প্রকারের পদার্থের আসক্তি থেকে পৃথক হয়ে অনাসক্ত ও প্রকৃতিজীত ভব

কোনও পদার্থ যদি কর্মইন্দ্রিয়কে বিচলিত করে, অর্থাৎ আসক্তির ভাব উৎপন্ন হয়, তবে স্বতন্ত্র হতে পারবে না। ইচ্ছাই আসক্তির রূপ। কেউ যদি বলে, ইচ্ছা নেই কিন্তু তা ভাল লাগে, তা হল আসক্তির অতি সূক্ষ্ম রূপ, অতএব তাকে আরও সূক্ষ্মরূপে এমন ভাবে চেকিং করো যে, পদার্থ অর্থাৎ যা অল্পকালের সুখের সাধন, তা আকৃষ্ট করছে না তো ? পদার্থ তো প্রাকৃতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ, তাই তা থেকে অনাসক্ত অর্থাৎ পৃথক হতে পারলেই প্রকৃতিজীৎ হতে পারবে।

স্লোগান:- "আমার আমার" - এই ঝামেলাকে ঝেড়ে ফেলে, অসীমের ভাবে থাকো - তাহলেই বলা হবে বিশ্ব-কল্যাণকারী।